পরিব্রাজকের ডায়েরি

নির্মলকুমার বসু

সম্পাদনা

অভীককুমার দে

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

নিবেদন

নির্মলকুমার বসু নামটির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি শব্দ যেন আগে পরে আপনা-আপনি জুড়ে যায়, যেমন অধ্যাপক, নৃতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক, গান্ধিবাদী ইত্যাদি। পরনে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি, কখনো চলেছেন হেঁটে বা সাইকেলে। এরকমই চেনা ছবির মানুষটি ঢুকছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস নিতে, ভারতীয় মানববিজ্ঞান সর্বেক্ষণের অধিকর্তা বা কমিশনার জাতীয় আদিবাসী ও তপশিল শ্রেণি কমিশনের দায়িত্ব পালন করছেন। গান্ধিজির সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন রয়েছেন, তাঁর সহকারী বা সহকর্মী রূপে, কাজ করছেন। আবার আপনমনে মন্দিরের চূড়া থেকে গর্ভগৃহ পর্যন্ত ছবি তোলার সঙ্গে চলছে মাপঝোখ। পরম কৌতূহলে শুনছেন বা দেখছেন এ দেশের আদিবাসীদের রীতিনীতি। তাদের সমস্যার প্রতিকার করতে সরকারের কাছে প্রতিবেদন পাঠাচ্ছেন। শহুরে মানুষের আচার-আচরণ পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার প্রতিও তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনকারী হয়ে পুলিশের গাড়িতে চড়ে চলেছেন জেলে। নিত্যভাবনার ফসলে ভরে উঠছে রোজনামচার পাতা। অবসর মতো সেখান থেকে নেওয়া তথ্য দিয়ে রচিত হচ্ছে গ্রন্থ, প্রবন্ধ বা রিপোর্ট। সুযোগমতো আশেপাশের শিশুদের সঙ্গে তাদের খেলার সঙ্গী হতেও বাধা নেই।

নির্মলকুমার বসুর দেশ পরিক্রমা প্রায় জন্মাবধি। বাবা বিমানবিহারী বসু ছিলেন সরকারি চিকিৎসক। তাঁর কর্মক্ষেত্র শুধু বাংলাদেশেই ছিল না, বিহার আর ওড়িশাও তাঁর এলাকার মধ্যে পড়ত। নির্মলকুমারের বিদ্যালয়ের পড়াশোনা পাটনা, কলকাতা, রাঁচি হয়ে শেষ হয় পুরী জেলাস্কুলে। ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। স্বাভাবিকভাবেই শৈশব থেকে কৈশোরে পৌঁছতে তাঁর পরিক্রমা হয়ে গেল বাংলা, বিহার আর ওড়িশা। চার ভিন্ন পরিবেশে পড়াশোনা ও জীবনযাপনে নির্মলকুমারের কোনো-রকম অসুবিধে তো হয় নি বরং তাঁর মন সমৃদ্ধ হল। সহজভাবে সহজেই ভিন্নভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর মানুষদের কাছে আসার সুযোগ পেলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসেবে ইংরেজি সংস্কৃতের সঙ্গে মাতৃভাষার মতো রপ্ত করেছেন হিন্দি এবং ওড়িয়া।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএস সি পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। পাশাপাশি সি এফ এণ্ড্রুজের সহকারি হয়ে ফিজি থেকে প্রত্যাগত শ্রমিকদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা করেছেন। কৈশোরে পিতৃহারা নির্মলকুমারকে মা কিরণশশী কোনো কাজে বাধা দেননি। আপন মনে নিজের কাজে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন নির্মলকুমার। অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে মনোযোগী হলেন পড়াশোনায়। বাবার করে যাওয়া দুটি বাড়ির একটি ছিল রাঁচিতে, অন্যটি পুরীতে। পুরীতে ফিরে স্থাপত্যবিদ্যার চর্চা আরম্ভ করলেন।

পুরী মন্দিরের পুণ্যার্থীদের নিজের গরজে দর্শনার্থী করার ব্রত নিয়েছিলেন। এদেশে মানুষ আসে পুজো দেয় চলে যায়, আড়ালে থাকে মন্দির স্থাপত্যের এই অনুপম অজস্র নিদর্শন। পুণ্যার্থীদের ধরে বসিয়ে মন্দিরের ইতিহাস স্থাপত্য সম্বন্ধে সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করতেন। একদিন দর্শনার্থী দলে ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এই তরুণ বাঙালির উদ্দেশ্য ও বক্তব্য শুনে রত্নটিকে চিনতে তাঁর দেরি হয়নি। নির্মলকুমারকে বললেন, জাতীয়তাবোধ তৈরি করার জন্য শিক্ষা দরকার আর সেই দায়িত্ব নিতে হবে দেশের ভালো ছেলেদের। পড়াশোনা সম্পূর্ণ করে তবেই সে সুযোগ পাওয়া যাবে।

আবার নির্মলকুমার ফিরলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯২৫ সালে নৃতত্ত্বে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সব বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে এম এস সি পাস করলেন। আবার শুরু হল তাঁর পথ চলা, দুচোখ মেলে দেখা আর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা।

অদূর ভবিষ্যতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার আহ্বান। কর্মজীবনেও তাঁর নানা বৈচিত্র্য দেশ-বিদেশের অধ্যাপনার কাজ এবং অন্যান্য দায়িত্বের ভার। এরই মধ্যে তাঁর পরিব্রাজক মনটি পথের নেশায় পথ চলেছে আর তার নানা প্রাপ্তি পরম মমতায় ছোটো ছোটো রচনায় ধরে রেখেছে। ভারতীয় সমাজে উচ্চ থেকে নিম্নবর্গের মানুষদের জীবনাচারণে বৈচিত্র্যের ছবি, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে যেভাবে অনুজ্জ্বল ব্যক্তি উজ্জ্বলতায় ভাস্বর হয়ে ওঠে, কথার আঁচড়ে সে সব ছবি আঁকেন যা প্রায় কথাসাহিত্যের সীমানায় পৌঁছে যায়। সে সব লেখায় বিজ্ঞানের তত্ত্বালোচনা নেই। আছে স্বতঃসিদ্ধ প্রাণের কথা। অতিবিচিত্র সব জীবনের ছবি। দেশের অরণ্যবাসী, সমাজের প্রান্তবাসী যাদের মনে সনাতন ভারতের বিশ্বাস ধর্ম দর্শনের শিখাটুকু জ্বলছে। আছে আধুনিকতা আর অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান টানাপোড়েনে ক্লান্ত নাগরিক জীবনেরও কথা।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এক স্মৃতিচারণায় বলেছেন, নির্মলকুমার বসুর *হিন্দু সমাজের গড়ন* বইটি পড়তে পড়তে তাঁর মনে পড়েছে *Anthropology from a Pragmatic Point of view* গ্রন্থে ইমানুয়েল কান্টের বক্তব্য, 'anthropology is not a study of what nature makes of man, but of what man as a freely acting entity makes of himself or should make of himself,' অর্থাৎ প্রকৃতির হাতে তৈরি মানুষ— নৃতত্ত্বচর্চার বিষয় নয়, বিষয় — স্বাধীন সক্রিয় সত্তাবান মানুষ নিজেকে যেমন করে গড়ে তোলে বা যেমন গড়ে তোলা অভিপ্রেত। নির্মলকুমার বসু বিজ্ঞানের কঠোর নিয়ম মেনে নৃতত্ত্বের সমীক্ষা করতেন, কিন্তু সর্বদাই তাঁর লক্ষ্য থাকত মানুষের বাস্তব অবস্থার জন্য কিছু-না-কিছু করা। তাঁর সুগভীর বৈজ্ঞানিক সন্ধিৎসা আর মানব-কল্যাণেচ্ছা সুগভীর উৎকণ্ঠা সামঞ্জস্যে মিলিত হয়েছিল।

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নিয়ে *পরিব্রাজকের ডায়েরি*-র প্রথম প্রকাশ ১৩৪৭ (১৯৪০) সালে। কয়েকটি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫২-তে

(১৯৪৫)। নির্মলকুমার বসুর জীবনাবসানের (অক্টোবর ১৯৭২) পর ডিসেম্বর ১৯৮২-তে প্রকাশিত এই গ্রন্থের একটি সংস্করণ আমাদের নজরে এসেছে। এই সংস্করণটিতে নির্মলকুমার-কৃত সংস্করণে রচনাগুলির যে বিন্যাসক্রম আছে তার বদল ঘটেছে এবং বিস্তর পাঠভেদ লক্ষ করা যায়। আমরা মান্য করেছি নির্মলকুমারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণটিকে।পূর্বসংস্করণগুলিতে এই লেখাগুলি কোন পত্রিকায় কবে প্রকাশিত হয়েছিল তা অনুল্লিখিত ছিল, এখানে সে তথ্য সংযোজিত হল।

সম্ভবত তৃতীয় একটি সংস্করণের ইচ্ছা নির্মলকুমারের ছিল, তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখা একটি দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রন্থে আরও কয়েকটি এই জাতীয় রচনার তিনি সংরক্ষণ করেছিলেন। যার মধ্যে একটি অপ্রকাশিত রচনাও ছিল। নির্মলকুমার বসুর ভাগিনেয় শ্রী রবীন্দ্রনাথ বসুর সৌজন্যে আমরা সেগুলি ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি। বর্তমান সংস্করণে সেগুলিকে আমরা সব শেষে সংযোজন অংশে স্থাপন করলাম।

আর রইল একটি চিঠি যেটি 'সাধু' রচনাটির সূত্রে *শনিবারের চিঠি*, বৈশাখ ১৩৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজি সাহিত্যের একটি উদ্ধৃতি মূলগ্রন্থ পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে কল্যানীয়া পারমিতা দাশ আমাকে সাহায্য করেছেন।*পরিব্রাজকের ডায়েরি*-র হিন্দি অনুবাদ ১৯৯৭ সালে ইন্দিরা গান্ধি রাষ্ট্রিয় কলাকেন্দ্র, নতুন দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রী অরুণকুমার সিং-এর সৌজন্যে সেটি দেখবার সুযোগ আমরা পেয়েছি। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। *পরিব্রাজকের ডায়েরি* পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দিয়ে শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু আমাদের বাধিত করেছেন। পুনশ্চ-এর কর্ণধার শ্রী সন্দীপ নায়ক এই সংস্করণটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন বলে নিশ্চিন্ত হয়েছি এবং অল্প সময়ের মধ্যে যে এটি প্রকাশ করা গেল সেজন্য তাঁর যেমন আনন্দ আমারও তেমনি।

বইমেলা
২০০৭

অভীককুমার দে

ভূমিকা

পরিব্রাজকের ডায়েরির প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে লেখা। সেগুলিকে বই-এর আকারে সাজাইতে গিয়া যে সূত্র অবলম্বন করিয়াছি তাহার পরিচয় পাঠকগণের নিকট দেওয়া প্রয়োজন, নয়তো সমস্ত ডায়েরিটি তাঁহাদের কাছে এলোমেলোভাবে সাজানো বলিয়া মনে হইতে পারে।

শহুরে জীবনের জড়তা ও ক্লান্তি দূর করিবার জন্যই প্রথমে প্রকৃতির স্বরূপসন্ধানে অনুরাগী হইয়াছিলাম। প্রথম পাঁচটি লেখায় সেইজন্য প্রকৃতির রূপই বেশি ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার সঙ্গে বনে জঙ্গলে যে-মানুষ বাস করে তাহাদের সংস্কৃতির অপরিচিত এবং অনভ্যস্ত রূপের সংবাদও স্থান পাইয়াছে। কিন্তু সেখানে ব্যক্তির স্থান নাই, অচেনা সংস্কৃতি তাহার সমগ্রতা লইয়াই প্রথমে মনের নিকট ধরা দেয়।

কিন্তু ক্রমে সেই সকল সমাজের সমগ্র রূপ টুটিয়া এক-একজন ব্যক্তির রূপ স্পষ্টতর হইয়া উঠে। দ্বিতীয় স্তবকের লেখাগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। গ্রামের সংস্কৃতির মধ্যে যাহা কিছু জীবন্ত, যাহা কিছু সত্য তাহা ধাওতাল অথবা চইতার মতো মানুষের চরিত্রসৃষ্টির মধ্যেই পরিপূর্ণতা লাভ করে।

এমন মানুষের সন্ধান লাভের পর অন্তরে ভরসা পাইলাম। নিজেদের সমাজ এবং সংস্কৃতির মধ্যে অনুসন্ধান করিবার মতো উৎসাহ হইল। সেখানে আসিয়া দেখিলাম, মানুষ নানা রূপে নিজেকে বিকশিত করিয়াছে। কেহ কবি, কেহ শিল্পী, কেহ দেশসেবকের আকৃতিতে আমাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। ধাওতাল অথবা চইতার মধ্যে অরণ্যজাত বৃক্ষের যে ঋজুতা বর্তমান, হয়তো ইহাদের মধ্যে তাহা নাই। হয়তো জনবহুল সমাজের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে বর্ধিত হওয়ার ফলে সকলের দেহে আঘাতের চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু যেখানে তাঁহাদের চিত্ত জয়যুক্ত হইয়াছে সেখানে চরিত্রের মহত্ত্ব যেন আকাশের স্পর্শ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই ভরসায় আরও নিবিড়ভাবে আমাদের চারিদিকের সমাজের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। ঘনিষ্ঠ দৃষ্টির ফলে অনেক দুর্বলতাই চোখে পড়িল। কিন্তু আঘাত করিবার ইচ্ছা হইল না, উপহাসের অধিক আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। 'অধ্যাপক' হইতে 'স্বর্গের সংবাদ' পর্যন্ত লেখাগুলি চতুর্থ পর্যায়ে পড়ে।

পঞ্চম স্তবকের লেখাগুলিতে উপহাসের আঘাতটুকুও আর নাই। প্রকৃতির সংস্পর্শে, প্রকৃতিজ মানুষের ঋজু ব্যক্তিত্বের সঙ্গগুণে যে-শক্তি লাভ করিয়াছিলাম তাহার প্রভাবে পারিপার্শ্বিক জীবনের গ্লানিটুকুও যেন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলাম। আমাদের সমাজের মধ্যে, শহরের সংস্কৃতির আবেষ্টনের ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করিয়াও মানুষ যে পূর্ণতম ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে পারে এই সত্যের সন্ধানে ভক্তিভরে তীর্থের শেষ অঙ্কটুকু আগাইয়া চলিলাম।

ফলে যাহা লাভ হইল তাহা 'স্বস্তিক' হইতে শেষ পর্যন্ত অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ধাওতাল অথবা চইতার সারল্যের মধ্যে যে মহত্ত্ব পাইয়াছিলাম তাহারই দর্শন আরও জটিলতর জনবহুল সমাজ্যের মধ্যেও পুনরায় পাওয়া গেল। মানুষের ব্যক্তিত্ব যে আবেষ্টনের সর্ববিধ বন্ধনকে অতিক্রম করিতে পারে, এই সত্যের সমর্থনই আমার সকলের চেয়ে বড়ো লাভ হইল।

মানুষের মন অজেয়। অজয়নদীর কূলে এই অতি পুরাতন সত্যটিকে নিজের জীবনে নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলাম। প্রকৃতিও সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে নূতন রূপে ধরা দিল। তাহা 'বসন্ত' অথবা 'উৎসব' প্রবন্ধের প্রকৃতির মতো সরল নয় বটে, তদপেক্ষা গুরু, হয়তো জটিল, কিন্তু সত্যের গুণে ভাস্বর। তীর্থের অন্তকালে এই যে নবীন, অথচ প্রাচীন, সত্য জীবনে লাভ করিলাম তাহা যেন আমাদের সকলের জীবনকে শক্তি এবং সমৃদ্ধি দান করে, ইহাই প্রার্থনা করি।

মহালয়া
১৩৫২

[নির্মলকুমার বসু]

প্রবন্ধ সূচি

কোলেদের দেশ	.....	১৩
শহর	.....	১৬
বসন্ত	.....	১৮
উৎসব	.....	১৯
সমুদ্র	.....	২৩
ধাওতাল ওরাওঁ	.....	২৬
বনের সংবাদ	.....	২৯
চইতা	.....	৩২
সন্ন্যাসী	.....	৩৫
কবি	.....	৩৯
সাধু	.....	৪১
শিল্পী	.....	৪৫
দেশসেবক	.....	৪৮
অধ্যাপক	.....	৫২
রঘুয়া	.....	৫৪
ইতিহাসের গবেষণা	.....	৫৬

রাজপুত্র ৫৯
সাহিত্যসভা ৬৩
স্বর্গের সংবাদ ৬৫
স্বস্তিক ৬৯
সন্তোষ সিংহ ৭১
আবদুল গফার খান ৭৪
মশরুরের সাধু ৭৮
বীরভূমে দুর্ভিক্ষ ৮০
মহাত্মা গান্ধি ৮৪
বুদরো ৮৮
সাধক ৯০
তুলসীদা ৯৩
বুড়ু ৯৬
অজয় নদী ৯৯

সংযোজন

চম্বা ভ্রমণ ১০৩
তাপস ১০৯
স্মোক নুইসেন্স ১১০
কিপ টু দি লেফট ১১৩
কাজের ভিড় ১১৬
ভদ্রতা ১১৮
হঠযোগ ১১৯
গল্প ১২২
গল্প বল ১২৪
আনন্দ ১২৭
চিঠি ১২৮

সিংভূম জেলার একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। নিকটে একটি পার্বত্য নদী। তাহারই কূলে নাকি এক অতি প্রাচীন কালে মানব বাস করিত। তখনও ধাতুর আবিষ্কার হয় নাই, পাথরের অস্ত্রশস্ত্র দিয়াই মানুষ নিজের সব কাজ চালাইত। সেই যুগের কিছু অস্ত্র এ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে শুনিয়া এখানে অনুসন্ধানের জন্য আসিয়াছি। সকাল হইতে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া দুইখানি চমৎকার কুঠার খুঁজিয়া পাইয়াছি; নীল কঠিন পাথরের তৈয়ারি, কী তাহার ধার, কী সুন্দর গড়ন!

সেই যুগের মানুষের কথা ভাবিতেছি। শুধু কুঠার কেন? ইহারা কি কেবল যুদ্ধই করিত? পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ইহাদের ছিল না? না, তাহা হয় না। হয়তো চাষবাসের যন্ত্রগুলি তাহারা কাঠের দ্বারা নির্মাণ করিত, এখনও পৃথিবীর কোনো কোনো জাতি তাহা করিয়া থাকে। হয়তো পাথরের কুঠারগুলি অন্য কোনো উপায়ে ব্যবহৃত হইত, যাহা আমাদের এখন জানা নাই। যাক, বৃথা কল্পনা করিয়া লাভ নাই। এই রকম পাথরের অস্ত্র নির্মাণ করিতে কত পরিশ্রম লাগে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।

নিকটে নদীর জল কলকলস্রোতে বহিয়া যাইতেছিল। দূরে অনাবৃত দেহে কয়েকজন কোল-রমণী স্নান করিতেছিল, কেহ বা পিতলের কলস মাটি দিয়া মাজিতে বসিয়াছিল। যাহারা স্নান করিতেছিল, তাহারা অনাবৃত দেহের আনন্দে হাসিতেছিল। আর দুইজন পরনের কাপড় পাথরের উপরে শুকাইতে দিয়াছিল। তাদের গায়ে শুধু ক্ষুদ্র কটিবস্ত্র ছিল বলিয়া পিছন ফিরিয়া কতক্ষণে কাপড় শুকায় তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল।

জলে নামিয়া দুইখানি ভাল পাথর কুড়াইয়া ভাঙিতে বসিলাম। ঠক্ ঠক্ শব্দে ঠুকিয়া ঠুকিয়া যাহা গড়ি, তাহাকে কল্পনার সাহায্যেই বলিতে হয়, ইহা কুঠার, ইহা কোদাল। দেখিয়া বলে কাহার সাধ্য? তবু ছাড়িলাম না, ঠুকিতে ঠুকিতে মোটামুটি যখন একখানি অস্ত্রের মতো পদার্থ গড়িয়া আনিয়াছি, তখন হঠাৎ শেষের আঘাতে তাহার অগ্রভাগ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। দুঃখ হইল বটে, কিন্তু প্রাচীন মানবের প্রতি আমার ভক্তি সহসা বাড়িয়া গেল। তাহাদের পরিপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর কুঠার তো আমার পাশেই আছে! কতখানি পরিশ্রম, কত কৌশল এবং অভিজ্ঞতাই না ইহার পিছনে লুকাইয়া আছে! পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করিত বলিয়াই কি তাহারা অসভ্য? ধাতুর ব্যবহার তখনও মানুষে শিখে নাই। কিন্তু যাহা জানিত, তাহার জন্য তো কম বুদ্ধি, কম অধ্যবসায় ব্যয় করে নাই।

অলস মধ্যাহ্নে এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম। দূরে মাঠ ধূ ধূ করিতেছিল। মাঘ মাসের শেষ, মাঠে আর ধান নাই, সব কাটা হইয়া গিয়াছে। কেবল নদীর পরপারে ক্ষুদ্র খেতে খেসারি ও ছোলার গাছ হইয়াছিল, সেখানে খড়ের সামান্য নীড় বাঁধিয়া একজন লোক পাহারা দিতেছিল। রাখাল বালকেরা গোরু-মহিষের পাল লইয়া জলের ধারে নামিয়া আসিতেছিল। তাহার মধ্যে একজন বাঁশের বাঁশিতে অতি সাধারণ একটি সুর বার বার সাধিতেছিল, সুরটির মিষ্টতার যেন আর শেষ নাই। নদীর ধারে কোথাও বা এক-আধটি

কুলগাছ। কোল-রমণীগণ ইতস্তত জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করিতে আসিয়া কুল পাড়িতে লাগিয়াছিল। একজন গাছ ধরিয়া নাড়া দেয়, পাঁচজনে তাহা কুড়াইয়া খায়। ইহারা বনের মধ্যে একা চলে না, দুই চারিজন একসঙ্গে যায়। বোধহয়, একা যাইতে ভয় করে।

ওপারে যে ক্ষুদ্র গ্রামখানি দেখা যাইতেছিল তাহার প্রান্তে গভর্নমেন্টের পাকা সড়ক চলিয়া গিয়াছে। একদল কোল-রমণী সেই পথে মজুরি করিয়া ফিরিতেছিল। রৌদ্রতপ্ত অপরাহ্ণে তাহারা এক বৃক্ষের ছায়ায় বসিল। আমি পাথরের উপর বসিয়াই তাহাদের দেখিতে পাইতেছিলাম। সিংভূমের অধিকাংশ অধিবাসী কোল হইলেও সময়ে সময়ে বাংলা গান গাহিয়া থাকে। রমণীগণ ছায়ায় বসিয়া গান ধরিল। কী গান ভালো বুঝিতে পারিলাম না,তবে দুই-তিনটি পরিচিত শব্দ কানে ভাসিয়া আসিল—পিরীতি, কালা, রমণী। এই খোলা মাঠের দেশে, যেখানে দূরে বনেভরা শ্যামল পাহাড়ের মালা দিগন্ত ঘেরিয়া আছে, সুরটি যেন সেখানে চারিপাশের সঙ্গে মিশিয়া যায়। অনেকক্ষণ তাহাদের টানিয়া টানিয়া গান গাওয়া শুনিলাম। পথ দিয়া একখানি মোটরলরি যাত্রীরদল লইয়া ধুলা উড়াইয়া ছুটিয়া গেল। বোধহয় কেহ রসিকতা করিয়া থাকিবে, রমণীগণের হাস্যে চকিত হইয়া উঠিলাম। তাহারা হাসিয়া উঠিয়া পড়িল এবং আবার পথ বাহিয়া চলিয়া গেল।

অলস দিবস পার হইয়া সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। জলের প্রান্তে নামিয়া আসিলাম। কত বিচিত্র রঙের পাথরের উপর দিয়া স্বচ্ছ জলধারা বহিয়া যাইতেছিল, তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। কোনোটি লাল, কোনোটির গায়ে সমান্তরাল কৃষ্ণরেখার মালা, জলতরঙ্গে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। কোনোটি বা নীলাভ চতুষ্কোণ, তরঙ্গের আঘাতে তাহার নীল আভা যেন নৃত্য করিতেছে। পাথরগুলিকে কুড়াইয়া লইলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, হাতে লইতেই তাহাদের শোভা নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাহারা প্রাচীন স্থাণু পাথরের খণ্ডে পরিণত হইল। কোথায় তাহাদের রূপ, কোথায় বা সেই রং!

কোলেদের জীবননাট্যের কথা ভাবিতে লাগিলাম। তাহারা আমাদের দেশের লোকের মতোই পরিশ্রম করে, লজ্জা পায়, ভীত হয়, গান গায়, বাঁশি বাজায়। সবই করে, কিন্তু যৌবনের কলরবে তাহাদের সবই যেন সুন্দর দেখায়। সেই একই মানুষের মন, এখানেও যেমন, আমাদের দেশেও তেমনই, প্রভেদ কেবল প্রকাশের রীতিতে। আমরা লজ্জিত হই, ভয় পাই, কিন্তু স্পষ্টভাবে যেন সব কথা প্রকাশ করিতে পারি না। কোলেরা প্রকাশ করিতে ভয় পায় না। আনন্দ হইলে গান গায়, খেলার ইচ্ছে হইলে খেলে। আবার স্ত্রীর নাচগান করা পছন্দ না হইলে চেলা কাঠ লইয়া তাহাকে তাড়া করে, স্ত্রী ভয়ে পলাইয়া যায়। কিন্তু তাহার প্রতি স্বামীর অনুরাগের আভাস পাইয়া পুলকিত মনে হাসে, ইহাও দেখিয়াছি। এই স্বচ্ছ প্রকাশেই ইহাদের জীবনকে আমাদের অপেক্ষা লীলায়িত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের জীবনের উপর দিয়া যেন স্বল্পতোয়া পার্বত্য নদী মুখর শব্দে বহিয়া চলিয়াছে, আর আমাদের জীবনের অন্তঃস্থল যেন সভ্যতার গভীর জলে ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। তাহার না আছে গতি, না আছে স্বচ্ছতা। আবরণের ভারে আমরা নিষ্পেষিত হইয়া আছি, জীবনের অন্তরে যাহা ঘটিতেছে, তাহা ঋজু সরলভাবে ভাবিতে বা করিতে আমাদের হৃদয় সংকুচিত হইয়া যায়।

মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনের কথা ভাবিতে আর ভালো লাগিল না। নদী পার হইয়া মাঠ

ভাঙিয়া প্রবাসের ঘরের দিকে ফিরিয়া চলিলাম। ওপারে গ্রামের প্রান্তে, নদীর কূলে দেখিলাম, কাহার একখানি নূতন সমাধি রচিত হইয়াছে। বোধহয় কোনো নারী হইবে; তাহাকে উত্তর শিয়রে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। মাটি একান্ত কাঁচা রহিয়াছে, সমাধির উপরে কতকগুলি পাথর চাপানো, যেন শিয়াল-কুকুরে শবদেহ লইয়া না যায়। আর তাহার উপরে একখানি দড়ির খাটিয়া পায়া ভাঙিয়া রাখা হইয়াছে। এই খাটেই নারীর দেহ শেষ প্রবাসের যাত্রায় আসিয়াছিল। কাছে একখানি কুলার উপরে লালপাড় শাড়ির ছিন্ন অংশ এবং কয়েকখানি হরিদ্বর্ণ পত্র সযত্নে সজ্জিত ছিল। আত্মীয়েরা হয়তো স্মৃতির উদ্দেশে বসন ও ভূষণের এই সামান্য আয়োজন নিবেদন করিয়া গিয়াছে।

মনটা ভারি হইয়া গেল। পথের উপর দিয়া ধীরে ধীরে ফিরিতে লাগিলাম। দূরে পাঁচ ছয় জন লোক একটি বাঁশে এক মৃত গাভীর চারি পা একত্র বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছিল। আশ্চর্য হইবার কিছুই ছিল না। গাভীর মাথাটি নেতাইয়া পড়িয়াছিল এবং বাহকগণের অসমান গতির জন্য দুলিতেছিল। হয়তো অল্পক্ষণ পূর্বেই ইহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু কাছে আসিতে হঠাৎ চমক লাগিল। গাভীটির পশ্চাদ্‌ভাগে অর্ধপ্রসূত বৎসের দেহার্ধ প্রলম্বিত হইয়াছিল, তাহার মাথা ও একটি পা যেন বাহির হইবার বিপুল চেষ্টায় টান হইয়া হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম, এই অনাগত বৎসই মাতার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। বাহকগণের পশ্চাতে এক ব্যক্তি আসিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মর গয়া? সে আমার দিকে না চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিল, হাঁ বাবু, মর গয়া।

হায় রে! জন্ম এবং মৃত্যুর এই দুর্জ্ঞেয় পটভূমির সম্মুখে আমরাও যেমন, এই অবোধ জীবও তেমনই। দুইজনের মধ্যেতে প্রভেদ কিছুই নাই, ব্যথা তো দুইজনেই সমান পায়। মানুষে মানুষেই বা প্রভেদ কোথায়? কেহ বা ক্ষণেকের আনন্দে কলরব করিয়া উঠে, কেহ বা করে না। কিন্তু দুইজনের পিছনেই সেই একই অজ্ঞেয় পটভূমি যাহার সম্মুখে জীবনের সকল লীলা আকাশের অন্ধকারের পটভূমির সম্মুখে নক্ষত্রের মতো জ্বলিতে থাকে এবং অবশেষে একদিন সেই অন্ধকারের মধ্যেই ম্লান শীতল হইয়া যায়। প্রাচীন যুগের প্রাচীন মানব যেমন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, আমরা সবাই তেমনই একদিন ধরিত্রীর ক্রোড় হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইব।

শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৪৫

শহর

যেসব শহরে মানুষ সদাই ব্যস্ত থাকে, হাতুড়ি পেটে, কলকারখানায় কাজ করে, প্রকৃতিকে নিংড়াইয়া লোহা তামা বা অন্যান্য ধনসম্পদ আদায় করিয়া লয়, যেসকল শহরে মানুষ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যজনোচিত বীর্যের দাপটে পৃথিবীর বুকে ইট পাথর ও লোহার স্তূপ রচনা করিয়া থাকে, তাহাদের কথা বলিতেছি না। তাহা ছাড়াও এক প্রকার শহর বা পল্লি আছে, যেখানে মানুষ ইটের বিবরের মধ্যে হাঁপাইয়া ওঠে, অথচ পেটের দায়ে বা সমাজের বন্ধনে হয়তো তাহাকে সেই বিবরের মধ্যে বারোমাস তিরিশদিন বাস করিতে হয়। এমনই শহরের একটি পুরাতন পল্লিতে বাসা খুঁজিতে বাহির হইলাম। অবশেষে বাসাও মিলিয়া গেল। অতি সংকীর্ণ একটি গলি, তাহার প্রবেশের মুখে আবর্জনার স্তূপ ও বর্ষার কাদায় মিলিয়া একটি দুর্লঙ্ঘ্য অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু ঘর দুইটি ভালো। নীচের তলায় হইলেও আলোবাতাস খেলে, কোলাহল নাই, তাই ঘরটি পছন্দ হইয়া গেল। স্নানের জন্য একখানি সংকীর্ণ কামরা আছে। বাড়ির মালিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, বেশ জল পাওয়া যায় তো? তিনি বলিলেন, ওঃ খুব তোড় আছে দেখবেন। একেবারে চারটে চড়াইপাখি ভেসে যায়, এমন তোড়। অতএব জলের বেগ সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না। যাক, বাড়ির মালিক লোকটি ভালো, কেবল দোষ যে দেখা হইলেই ব্যবসায়ে দুর্দিনের সম্বন্ধে গল্প করিতে বসেন।

এই সংকীর্ণ গলিটির মধ্যে বাস করিতেছি। বিকালে কাজকর্ম সারিয়া ঘরে ঢুকিয়া কেমন মনটা খারাপ হইয়া গেল। পাশের বাড়ির ছাদের উপর দিয়া আকাশের একটি টুকরা দেখা যায়, তাহাতে সূর্যাস্তের একটু লাল আভা দেখিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। কয়েক মিনিট হাঁটিলেই গঙ্গার ধারে পৌঁছানো যায়, সেই দিকেই হাঁটিতে লাগিলাম। অনেকেই চলিয়াছেন দেখিলাম। পথের উপরে গাড়িঘোড়ার বিশেষ বালাই নাই, পরমানন্দে কতকগুলি গাভী ও বলীবর্দ মিলিয়া পথ অধিকার করিয়া আছে। তাহার মধ্যে কেহ পরম স্নেহে অপরের দেহ চাটিতেছে, কেহ বা চোখ বুজিয়া জাবর কাটিতেছে। দুইটি বাছুর আচম্বিতে বৃদ্ধদের দল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং পরস্পরের শৃঙ্গহীন মাথা ঠেকাইয়া ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়া দিল। একটি নিরীহ গর্দভ পথের ধারে দাঁড়াইয়া ছিল। এক পাল স্কুলের ছেলে দল বাঁধিয়া এক দিস্তা কাগজ কিনিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল, তাহারা সেই কাগজের বান্ডিল দিয়া গর্দভের পিঠে ঘা দুই তিন বসাইয়া দিল। গর্দভটি যেমন ছিল তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল, কেবল একবার কান দুইটি নাড়িল, বালকের দল হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

পশ্চিম আকাশে তেতলা চারতলা বাড়ি এবং ইলেকট্রিকের থামের মাথা ডিঙাইয়া দূরে মেঘের পুঞ্জ ও সূর্যালোকের লাল আভা দেখিতে পাইলাম। জলে নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন উপরের বাতাসের জন্য হাঁপাইয়া ওঠে, আমার মনও তেমনই এই ইট ও পাথরের স্তূপ লঙ্ঘন করিয়া মুক্তির জন্য হাঁপাইতে লাগিল।

অবশেষে গঙ্গার ধারে আসিয়া পৌঁছিলাম। এতক্ষণে দূরের রূপ দেখিতে পাইলাম। সারা

দিনমান চোখের দৃষ্টি রাস্তার দুই ধারে দেওয়াল হইতে দেওয়ালে ঠোক্কর খাইয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছে। সবই কাছের জিনিস। গঙ্গার ধারে আসিয়া বাঁচিয়া গেলাম। দূর হইতে সুদূরের অস্পষ্ট জিনিস দেখিয়া চোখ জুড়াইয়া গেল। হউক তাহা পাটকলের চিমনি, তবু তো দূরের জিনিস। গঙ্গার বক্ষে জেলেদের ডিঙি ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহাদের সুঠাম রেখায় ও শান্ত অথচ ক্ষিপ্র গতিতে মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

দেখিলাম, শুধু আমি নয়, বহু মানুষই আমার মতো গঙ্গার ধারে বেড়াইতে আসিয়াছে। কেহ ঘাটের সিঁড়ির উপরে বসিয়া আছে, কেহ শুধু গঙ্গার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহাদের মুখে আনন্দ বা নিরাশা কিছুই নাই, শুধু বালকের মতো চাহিয়াই আছে। কোথাও ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা ঘাটের সিঁড়িতে ওঠানামা করিয়া খেলিতেছে। একজন বৃদ্ধ শুধু-পায়ে, গায়ে কোট পরিয়া জপ করিতেছিলেন। বৃদ্ধকে একটু ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তাঁহার চোখ মুদ্রিত, কপোলে জলের বিন্দু, একটি বিন্দু গড়াইয়া নাকের ডগায় স্থির হইয়া রহিয়াছে, ক্ষিপ্র অঙ্গুলিসঞ্চালনে করমালায় জপসাধনা করিতেছেন। হাত কাঁপিতেছে, যেন অন্তরের বেদনায় অধীর হইয়া তিনি জোর করিয়া জপ সমাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার জপ শেষ হইল। তিনি তখনও চক্ষু মুদিয়া পূর্ব পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া কপালে হাত তুলিয়া সুদীর্ঘ প্রণাম করিতে লাগিলেন। যেন চতুর্দিকের দেব দানব গন্ধর্ব যক্ষ রক্ষ সকলকে সন্তুষ্ট রাখিয়া তিনি তাহাদের প্রসাদে কোনো রকমে ফাঁকে ফাঁকে একটু বাঁচিয়া থাকিতে চান।

উপরে আকাশ তখন ম্লান হইয়া আসিতেছে। পশ্চিম দিগন্তে মেঘের শেষ কয়েকটি ক্ষীণ রেখায় তখনও লালবর্ণের আভাস রহিয়াছে। ঊর্ধ্বে বিচ্ছিন্ন মেঘের পুঞ্জ ধীরে ধীরে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে অচঞ্চল গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। সেই দিকে চাহিয়া সবই বড়ো, সবই বিশাল, সবই সুদূর মনে হইতে লাগিল।

মানুষের সুখ, মানুষের দুঃখের কথা ভুলিয়া গেলাম। দেখিলাম সকল মানুষই গঙ্গার ধারে মানুষের সঙ্গ ছাড়িয়া প্রকৃতির সহিত সঙ্গ করিতে আসিয়াছে। পুরানো বাড়ির ফাটলের মধ্যে আগাছা জন্মাইয়া যেমন আলোর দিকে, আকাশের দিকে গ্রীবা বাড়াইয়া দেয়, ইহারাও সকলে তেমনই করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ প্রকৃতির শান্ত সুন্দর রূপে, তাহার বিস্তারে বিশালত্বে অবগাহন করিতেছে। কেহ বা অন্তরে বেদনার আঘাতে মুদ্রিতনয়নে হৃদয়ের মধ্যে কল্পনার দেবতাকে অধিষ্ঠিত করাইবার ব্যর্থ প্রয়াসে ক্ষিপ্তের মতো অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছে।

আমার মন শান্ত হইয়া গেল, কিন্তু সেই বৃদ্ধের জন্য মনের কোণে একটু বিষাদ লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৬